Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIV Issue : V, 15th, August, 2024 ১লা শ্রাবণ, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

অগাস্ট মাসটা আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের জন্য উল্লেখযোগ্য সময়কাল। ১৯৪৭-য়ে এই মাসেই আমরা পেয়েছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি। দারিদ্র্য এবং সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি এখনও আমরা পাইনি, তবুও গণতন্ত্রের যেটুকু পরিসর পাওয়া গেছে তাই এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আজ পর্যন্ত কোনো পরাজিত রাজনৈতিক নেতাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়নি। শত কষ্ট-দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অন্যায়-অবিচার সত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম।

বাঙালিদের পক্ষে এই অগাস্ট আরও ঘটনাবহুল। আমাদের হৃদয়দেবতা-জীবনবল্লভ কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস, বাইশে শ্রাবণ, ফিরে ফিরে আসে এই অগাস্টের প্রথমার্ধে। আমরা নতুন করে আবার তার মাঝে আশ্রয় নিই, তার গানে-কবিতায় খুঁজে নিই আমাদের ভাঙাচোরা জীবনের পাথেয়।

এই অগাস্টে বেদনাহত চিত্তে আমরা দেখলাম প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এক বিচিত্র পালাবদল। যে আন্দোলন শুরু করেছিল ছাত্ররা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে অবশেষে তাই হয়ে দাঁড়ালো হাসিনা বিরোধী - ভারত বিরোধী আন্দোলন, সর্বোপরি এক চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতা। বঙ্গবন্ধুর মূর্তির গলায় জুতার মালা পরিয়ে বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা, থানা ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করা, পুলিশ ও বিপক্ষ দলের নেতা-কর্মীকে পিটিয়ে খুন করা, বিখ্যাত শিল্পীর বাদ্যযন্ত্র পুড়িয়ে দেওয়া— এ কোন বাংলা দেশ!

এ মাসেরই ৯ তারিখে আমরা হারালাম বঙ্গ রাজনীতির এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন বর্তমানের ধান্দাবাজ-দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের মধ্যে এক বিরল ব্যতিক্রম। বাংলাকে শিল্পসমৃদ্ধ করার তাঁর যে স্বপ্ন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ভবিষ্যত প্রজন্ম নিশ্চয়ই তার জবাবদিহি চাইবে। আমাদের স্মৃতিতে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত আদ্যন্ত সৎ মানুষটি, এক অভিমানী পরাজিত নায়ক হিসেবে রয়ে যাবেন।

কর্তব্যম কিম্

মৃগেন গাঁতাইত

বেঁচে থাকার অর্থাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদ সব চেয়ে প্রধান। এটাই জীব জগতের নিয়ম— বেসিক ইন্সটিংট, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যা করণীয় সেটাই সবার আগে করে। জমি আন্দোলনে চাষীরা যদি খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য জমি পায়, অথবা নিজের জমি লুট হওয়া থেকে রক্ষিত থাকে তাহলে তারা জমি আন্দোলনে থাকবে। তার জন্য হিংসার আশ্রয় নিতে ভয় পায় না। কেউ যদি সস্তায় খাবার দেয় তাহলে মানুষ সেটাই চাইবে। তামিলনাড়ুতে আম্মার কিচেনে মানুষ তাই পাচ্ছিল। সেই জন্য তামিলনাড়ুতে মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা দুর্নীতির দায়ে জেলে যাওয়ার পরে তার শূন্য আসনে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ললিতার দলের যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিল সে আরো বেশি ভোটে জিতেছিল। যদি নগদে কেউ কিছু টাকা দেয় তাহলে মানুষে সেটাই চায়। এখন তো বাঁচি। বেঁচে থাকার জন্য সামান্য সাহায্য পেলেই মানুষ খুশি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় থেকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য স্পষ্টত প্রতীয়মান অসৎ চোর লুণ্ঠনকারী অন্য দলের সাহায্য নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। নীতি, দুর্নীতির ব্যাপারটা গৌণ। নীতি, দুর্নীতি, এগুলো হল সুপারস্ট্রাকচার (ঘরের কাঠামো তৈরির পরে প্লাস্টার বা রঙ)।

মুক্তির সংগ্রামে, লং মার্চে, মুক্তাঞ্চলে, শাসকবিরোধী প্রতিবাদ প্রতিরোধ— সর্বত্রই দেখা যায় যখন মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা, তখনই মানুষ প্রতিরোধ করে। জমি জঙ্গল কেড়ে নিলে সাধারণ মানুষ অস্ত্র তুলে নেয়। NRC, CAA এর ফলে অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনাই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অযোধ্যায় জমিহারারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নির্বাচনে। মুসলমানবিরোধী প্রচার মুসলমানদেরকে এককাট্টা হয়ে বিরোধিতায় সামিল করেছে।

আমরা যারা সুখী সমাজের (সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রভূতবৈষম্যহীন, স্বাধীন জীবন যাপনের সহায়ক) স্বপ্ন দেখি, এবং তার জন্য কিছু না কিছু কাজ করতে চাই, তারা তাহলে কি করব?

অপরের খারপ সম্বন্ধে শুধু বললে হবে না, মানুষকে বিকল্প ব্যবস্থার পক্ষে জড়ো করতে হবে। বিকল্প কী চাইছি সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে, কথা বলার সাথে সাথে বিকল্প নির্মাণ করে দেখাতে হবে যে তা তাদের পক্ষে আরো কল্যাণকর। ছোট ছোট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে। সরকারি অর্থের দুর্নীতি তো গ্রামে গঞ্জে হচ্ছে। সেই ছোট ছোট ক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিবাদ করে দেখাতে হবে।

যদি মানুষকে সংগঠিত করা হয় যৌথ সমবায়ভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব রক্ষাকে সুদৃঢ় করার জন্য, তাহলে সেটা হবে পজিটিভ বিকল্প।

বিশ্বের কিছু অর্থনীতিবিদ ঢালাও অনুদানের পক্ষে সওয়াল করছে। আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ছাড়া এমন প্রকল্প আসলে উৎকোচ দিয়ে সমর্থন কেনার সামিল। প্রজা কল্যাণের নামে অনুৎপাদক

অনুদান সমাজটাকে কুরে কুরে তিলে তিলে কর্মবিমুখ আত্মবিনাশী দেশ পরিণত করবে। অনুদাননির্ভরতায় মানুষকে বশে রাখার প্রতিযোগিতা চলছে সারা দেশে। এক রাজনৈতিক দল তো সারা বছরে এক লাখ টাকা দেবে বলছে, অর্থাৎ মাসে আট হাজার টাকার বেশি। অনুৎপাদক অনুদান যেহেতু ব্যক্তি মানুষের এবং দেশের মানুষের কর্মক্ষমতাকে ক্ষয় করতে থাকে, তাই এর বিপরীতে মানুষকে সংগঠিত করে যৌথ সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব রক্ষাকে সহজ করা সম্ভব। ছোট ছোট জায়গায় একটা দুটো গ্রামে শুরু করতে হবে। সৎভাবে রূপদান করতে পারলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোকে তা প্রভাবিত করবে। সরকারি সমবায়ের তামাশা নয়, সমবায়ের যে মূল ভাবনা (যৌথ নিরাপত্তা, যৌথ উন্নতি) তাকে আত্মস্থ করে রূপ দিতে হবে। সমবায় হল ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভ্রূণ। কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (ভ্যান, রিক্সা, পরিবহন শ্রমিক ইত্যাদি) সবাইকে নিয়ে সমবায় করা যায়। জমির ব্যক্তি মালিকানা বজায় রেখেও আনুপাতিক হারে ফসল উৎপাদনের ভাগ পাওয়া যেতে পারে সমবায় চাষের মাধ্যমে। মাছের ভেড়ি হল তার উদাহরণ, যেখানে আনুপাতিক হারে জমির মালিকদের টাকা দেওয়া হয়। সেখানে লাভ হয় ব্যক্তি ভেড়ি মালিকের, জমির চরিত্র নষ্ট হয়, ফসল বৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

বক্সা দুর্গ ও লেপচাখা

সমীর কুমার ঘোষ

আমাদের ক্লাব সাউথ ক্যালকাটা মাউন্টেন লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৫ম অল বেঙ্গল মাউন্টেনার্শ এন্ড ট্রেকার্স মিটে যোগ দিতে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে আলিপুর দুয়ারে উপস্থিত হই। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দুবার মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী বীর নওয়াং গম্ভু মহাশয়। সন্ধ্যায় নওয়াংজীর মুখে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরাহোণের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। পরদিন চিলাপাতা এবং খয়ের বাড়ি সংরক্ষণ বনভূমি ঘুরে আমরা ৮৯ জন অংশগ্রহণকারী সদস্য দেখতে গেলাম রসিক বিল, মদন মোহন মন্দির, বালেশ্বর মন্দির, জল্পেশ মন্দির ও কোচবিহার রাজবাড়ি। এরপর আলিপুর দুয়ারের রোভার্স ক্লাব আমাদের ১৮ জন সদস্যকে নিয়ে যায় জয়ন্তী ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সংরক্ষিত অরণ্য দেখানোর জন্য।

১৫ জানুয়ারি, প্রখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেনের নেতৃত্বে আমরা এসে পৌছলাম রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে। এখানে প্রবেশমূল্য জমা দিয়ে বক্সা ও জয়ন্তী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে আলিপুর দুয়ার যেতে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে সান্তালাবাড়ি এসে পৌছাই দুপুর নাগাদ। রাজাভাতখাওয়া এরকম অদ্ভুত নামকরমের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলাম ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা। সে সময় ভুটানরাজের অধীনে ছিল এ সমস্ত অঞ্চল। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী কোচবিহার রাজা ঠিক করলেন ভুটানরাজার দখল করা অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত তিনি ভাত খাবেন না। তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা

রাখতে তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধাভিযান শুরু করলে খবর যায় ভুটানরাজের কাছে। বিপদ বুঝে তিনি সন্ধির প্রস্তাব দেন। শর্ত মেনে দখল করা বক্সাদুয়ার ছেড়ে ভুটান রাজা ফিরে যান নিজ দেশে। ফলে শপথ পূরণ হতে কোচবিহার রাজা মহাভোজের আয়োজন করেন এই জঙ্গলে। পরিশেষে এখানেই সদলবলে ভাত খায়োর জন্য সেই থেকেই জায়গাটির নাম হয় রাজাভাতখাওয়া।

আলিপুরদুয়ার ছাড়তে পথের ধারে দুপাশে শাল, সেগুন আর মেহগনির জঙ্গলের মাঝে মসৃণ চওড়া রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। বাঁদিকে একটু তফাতে রাজপথের সমান্তরালে রেলপথ চলে গিয়েছে ডুয়ার্সের বুক চিরে নিউজলপাইগুড়ির দিকে। রাজাভাতখাওয়ার পর পেলাম বক্সাদুয়ার ব্যাঘ্র প্রকল্পের পথ জোড়া গেট। গেট অতিক্রম করার পর পথে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে বোর্ডে লেখা সতর্ক বাণী ''হাতি পারাপারের করিডোর''। আমরা সতর্ক হয়ে তাকিয়ে থাকি যদি গজরাজের দর্শন মেলে। দিনের বেলা বনচররা বড় একটা পথের ধারে আসে না। রাজাভাতখাওয়া থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে এসে পৌঁছাই সান্তালাবাড়ি বা সান্তারাবাড়ি (৯১৪ ফুট) চেক পোস্টে। শীতকালে এই গ্রামে প্রচুর কমলালেবু হয় এবং তা বেচা কেনার হাট বসে এখানে। স্থানীয় ভাষায় কমলা লেবুকে 'সান্তা' বলে থাকে। তাই এই গ্রামের অপর নাম 'সান্তাবাড়ি'। সান্তারাবাড়িতে পুনরায় প্রবেশ পত্র দেখিয়ে গাড়ি চলে পাহাড়ি পথে বক্সা ফোর্ট-এর উদ্দেশ্যে। প্রায় ২ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গাড়ি থামে জিরো পয়েন্টে, বলে— আর যাবে না। গাড়ি চলার পথ নেই, হেঁটেই বক্সা ফোর্ট। লেপচাখা গ্রাম যেতে হবে। অগত্যা সকলেই কাঁধে ব্যাগপত্র তুলে নিয়ে হাঁটা লাগাই বক্সা ফোর্টের কাছে সদর বাজারে রোভার্স ইন-এর উদ্দেশ্যে। দুপুরের চড়া রোদে মাত্র ২ কিলোমিটার চড়াই পথ ভাঙতে সকলে ঘেমে উঠি। জিরো পয়েন্টের পর একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে সেখান থেকে দেখা যায় বক্সা রিজার্ভ ফরেস্টের অনেকটা, দূরে অনেক দূরে সাপের মতো এঁকে বেঁকে জঙ্গলের পথে বয়ে চলেছে তিন নদী জয়ন্তী, বালান ও বক্সা। দেখতে দেখতে ইন্দ্র সঙ্কর থাপার রোভার্স ইনে পৌঁছে খবর দিতেই ইন্দ্র থাপা স্থানীয় কজেকজনকে নিয়ে পিছিয়ে থাকা সহযাত্রীদের সাহায্য করতে দ্রুত এগিয়ে যান, বয়স্কদের ব্যাগ পত্তর ইত্যাদি নিজেরাই কাঁধে তুলে নেন। সবাই গেস্ট হাউসে পৌঁছলে Welcome drinks পরিবেশন করে ঘর দেখিয়ে দেন। সে সময় রোভার্স ইন ছাড়া থাকার জায়গা বড় একটা ছিল না। লেপচাখা গ্রামে গেস্টদের জন্য বরাদ্দ ছিল একটি ঘর। সন্ধ্যায় গিটার বাজিয়ে কয়েকটা জনপ্রিয় বাংলা দেশাত্মবোধক গান শোনায় ইন্দ্র থাপা। একজন অবাঙালি যুবকের কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে খুব ভাল লাগে। জানলাম এভাবেই উনি বাঙালি ট্যুরিস্টদের মন জয় করে নিয়েছেন। এরপর দ্বিতীয়বার ২০১৩ সালে যখন বক্সা ফোর্ট ও লেপচাখা যাই দলের কয়েকজন বয়স্কা সদস্যা জিরো পয়েন্টে অপেক্ষা করেন। সেসময় বয়স্ক যাত্রী দেখে নীচ থেকে উঠে আসা একটি নেপালী যুবক কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান শোনান অপেক্ষারত যাত্রীদের। আমরা ফিরে আসতে ওনারা বলেন বাংলা দেশাত্মবোধক গানের আসরের কথা। শুনেই শিল্পীর নাম বলতে সবাই চমকে ওঠেন। বলেন— তুনি তো ছিলে না, তো জানলে কি করে? বলি এর আগে এসেছিলাম তখন থেকেই ওর সঙ্গে পরিচয় আছে। এ তল্লাটে এক ডাকে সবাই চেনে ইন্দ্র থাপাকে, তাঁর মুধর ব্যবহার ও বাংলা গানের জন্য উনি বিখ্যাত।

পরদিন সকালে প্রাত:রাশ করে বেরিয়ে পড়ি বক্সা ফোর্ট ও লেপচাখার উদ্দেশ্যে। সামান্য চড়াই

পথে সদরবাজার পেরোতেই দূর থেকে দেখা পাই পাহাড়ের শিরে বক্সা ফোর্ট (২৮৪৪ ফুট)। অতীতে এই সদর বাজার ছিল খুবই জমজমাট। সারা বছর এখানে লেনদেন চলত— ভুটিয়াদের কাছ থেকে হাতির দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ, সিল্ক, মধু, মোম, কস্তুরী, চা বিনিময় ভারতীয়দের কাছ থেকে অর্থ, চাল, সুপারী, তামাক ও পোষাক ইত্যাদি মিলত। এখন সদর বাজার তার অতীত গরিমা হারিয়ে শুধু নামেই টিকে আছে। বক্সা ফোর্টটি তৈরি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কারও মতে এটি তৈরি করেছিলেন তিব্বতের রাজারা আবার কেউ বলেন কামতাপুরের রাজা এই ফোর্টটি গড়েন।, পরে এটি ভুটিয়া রাজাদের অধীনে যায়। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যে রেশম বাণিজ্য পথটি ভুটানের মধ্যে দিয়ে যেত, সেটির একাংশ রক্ষার জন্য ভুটান রাজারা এই দুর্গটি ব্যবহার করতেন বলেই জানা যায়। বক্সা দুর্গ কবে তৈরি হয়েছিল তা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও এটুকু বলা যায় ব্রিটিশরা এই দুর্গ দখল নেওয়ার আগে এটি ছিল ভুটান ও কোচবিহার রাজাদের যোগসূত্র। পরবর্তীকালে, কোচবিহার রাজার আমন্ত্রণে ব্রিটিশরা ভুটিয়া রাজার দখলে থাকা দুর্গটি দখল করে নেয় ১৮৬৪ সালের ৭ ডিসেম্বর। পরে ১৮৬৫ সালের ১১ নভেম্বর সিঞ্চুলা চুক্তির অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বক্সা দুর্গটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ রাজের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুর্গটি আগে বাঁশের তৈরি ছিল। ব্রিটিশরা এটির সংস্কার করে পাথরের দুর্গে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩০-এর দশকের কিছু পূর্ব থেকে ব্রিটিশ শাসক এই দুর্গটি ব্যবহার করেন ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবীদের 'বন্দী শিবির' হিসেবে। যতদূর জানা যায় আনাদামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলের পর এটির অবস্থান ছিল।

বিনা বিচারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দী করে রাখার জন্য পাহাড়ের ওপর দুর্গম এই স্থান বেছে নেয় ইংরেজরা। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এখানে মোট বন্দী ছিলেন ৫২৫ জন। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বহু বিপ্লবীকে বিনা বিচারে বা বিচারের নামে প্রহসন করে এই জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— ত্রৈলোক্য মহারাজ, ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায়, ভূপতি মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, নিকুঞ্জ সেন, প্রমথ ভৌমিক, জ্ঞান চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিখ্যাত অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। হিজলী জেলে রাজবন্দীদের উপর অন্যায়ভাবে গুলি চালানোর প্রতিবাদে বক্সায় বিপ্লবীরা অনশনে বসেন। বন্দী বিপ্লবীরা বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সালের ২৫ বৈশাখ জেলের ভিতর রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেন এবং এই উপলক্ষে গুরুদেব ঠাকুরকে জন্মদিনের অভিনন্দন বার্তা পত্রাকারে পাঠান। কবি তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। একথা জানতে পেরে তিনি প্রত্যুত্তরে ১৯ জৈষ্ঠ্য বক্সাদুয়ার বন্দীশালায় নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখে পাঠান—

: বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি :

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্ধন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি

স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।
'অমৃত্যের পুত্র মোরা'— কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত এই ঐতিহাসিক দুর্গটিতে প্রবেশ করতে প্রথমেই বিপ্লবীদের লেখা অভিনন্দন পত্র ও কবির উত্তর সমৃদ্ধ দুটি প্রস্তর ফলক চোখে পড়ে। এর পাশ দিয়ে উঠে যাই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের দিকে। দুর্গটির অবস্থা আজ অতি করুণ। অধিকাংশ বন্দী কুটরীর ছাদ নেই। হাসপাতালের অবশিষ্টাংশ, ব্রিটিশ আধিকারিকদের থাকার ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়। যে কটি বিধ্বস্ত কুটুরীর ইঁট, কাঠ, পাথর অজও অবশিষ্ট রয়েছে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী। এমন ঐতিহাসিক দুর্গের এই হাল দেখে সত্যিই হতাশ হতে হয়। দুর্গের মাঝে রয়েছে অতীত ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী শতাব্দী প্রাচীন একটি বটবৃক্ষ, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আলিঙ্গন করে রেখেছে বন্দীশালার কুটুরীগুলিকে। নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের অভাবে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে সর্বত্র। তবু এরই মাঝে দেখা মেলে একটি শুদ্ধ জলাধারের। বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত। এছাড়া জলের অন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না দুর্গের মধ্যে। দুর্গের ১০০ ও ২০০ ফুট নীচে দুটি অবিরাম জলের ধারা ছিল। ওগুলোই ছিল পানীয় জলের উৎস। জলের ধারাদুটি বর্তমানে সচল। বক্সাদুর্গের বাইরে একটি পোস্ট অফিস ছিল। সেটি আজও আছে।

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে বহু বামপন্থী নেতা, কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের এখানে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিপ্লবী সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, বিনয় চৌধুরী, ননী ভৌমিক, চিন্মোহন সেহানবীশ, আব্দুল হালিম, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও কবি পারভেজ শাহিদ প্রমুখ ব্যক্তিত্বেরা।

তিব্বতের দ্রেপুং ছিল সে দেশের বিখ্যাত মনাস্ট্রিগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ মনাস্ট্রি। এই মঠে প্রায় ১০০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করতেন। ১৯৫৯ সালের মার্চে তিব্বতি জনতাকে অবদমিত করে এই মঠ তথা সমগ্র তিব্বতের দখল নেয় পিপলস পার্টি অব্ চায়না (চীন সরকার)। সেসময় মাত্র কয়েকশো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনা সৈনিকদের ঘেরাটোপ এড়িয়ে ভুটান অতিক্রম করে ভারতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। শরণার্থী সন্ন্যাসীরা প্রথমে বক্সা দুর্গ ও সন্নিহিত বনাঞ্চলে আশ্রয় লাভ করেন এবং পরে পরিত্যক্ত দুর্গে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, ১৯৬৬ সালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বক্সা দুর্গে আশ্রয় নেওয়া তিব্বতী শরণার্থীদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ গঠন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করলে শরণার্থীরা সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় যেতে অনিচ্ছুক হন। পরে দলাই লামার বার্তা পেয়ে এবং ভবিষ্যতের কথা

ভেবে নতুন বাসস্থানে যেতে রাজি হন। ১৯৭১ সালে তাঁরা কর্ণাটকের বাইলাকুপ ও মুন্দগদে স্থানান্তরিত হন।

১৯৮১ সালের মে মাসে বাংলার ঐতিহাসিক দুর্গটি জাতীয় স্মৃতিসৌধের মর্যাদা পায়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে একটি মিউজিয়াম গড়া হয়েছে দুর্গে।

চরম অবহেলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত দুর্গটি একঝলক দেখে নেমে আসি পথে। দুর্গের নিচে রয়েছে একটি ছোট গুম্ফা। সামান্য দূরে চায়ের দোকান। এক কাপ চা পান করে পথ ধরি লেপচাখা গ্রামের। এখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার ট্রেক করে যেতে হবে লেপচাখা গ্রামে। গ্রামটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানের কাছে যা আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা-জয়ন্তি ন্যাশানাল পার্ক-এর একটি অংশ। এই জায়গাটিকে আদর করে কেউ কেউ বলে থাকেন 'ডুয়ার্সের স্বর্গ'। পথের দুপাশের সবুজ গাছপালা, নানান রঙের ফুলের গাছ-গাছালি ও অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য চলার কষ্ট ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যায় প্রায় ৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় মেঘ মেদুরের দেশে। উচ্চতা তেমন না হলেও মাঝে মধ্যে দাঁড়াতে হয় সঙ্গী সাথীদের জন্য কারণ সবার বুকের জোর বা হাঁটুর ক্ষমতা তো সমান নয়। পাহাড়ে চড়াই ভাঙ্গার পরিশ্রমে এই শীতেও জামা ভিজে যায়, কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বলে এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন, কিন্তু সময় লাগে আরও বেশি। তবুও একে একে সবাই উঠে আসেন বাংলা ও ভুটান সীমান্তের রূপসী গ্রাম লেপচাখায়। গ্রামের কিছু আগে রয়েছে SSB Camp। গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হলেও এটি একটি ভুটিয়া গ্রাম। এখানকার সকল অধিবাসীই ভুটানের দ্রুকপা জনগোষ্ঠীভুক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ। ৭০/৮০টি পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে বাস করেন। এঁদের প্রধান জীবিকা চাষাবাদ। তবে বর্তমানে বেশ কয়েকটি পরিবার নেমেছে হোমস্টের ব্যবসায়। ১৯০৮ সালে দেখেছিলাম অতিথিদের থাকার জন্য একটি মাত্র ঘর ছিল মনাস্ট্রির পাশে। এরা খুবই অতিথি পরায়ণ। গ্রামের মাঝে তিব্বতি গুম্ফা আর তাকে ঘিরে রয়েছে প্রার্থনা পতাকা, হাওয়ায় উড়ছে পত্ পত্ করে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দেখা যায় উন্মুক্ত দিগন্ত সবুজ পাহাড়, ছোটো ছোটো গ্রাম, ধাপ চাষ জমি, নদীর ধারা আর সবুজ বনানী। বাংলার উচ্চ তরাইয়ের এই অখ্যাত গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চোখ ফেরাতে দেয় না। আমরা যে সময় এসেছি এসময় এদের 'লোসার' (LOSAR) উৎসবের আয়োজন চলছে। ছেলেরা রঙীন কাপড় দিয়ে ছোট ছোট মণ্ডপ বানাচ্ছে আবার কয়েকজন তীরন্দাজি অভ্যাস করছে। উৎসবের কথা জানতে বলল— প্রতিবছর ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসের মধ্যে বক্সার বিভিন্ন গ্রামে লোসার উৎসব পান করা হয়। তবে এ অঞ্চলের সব থেকে বড় সোলার উৎসব পালিত হয় লেপচাখায়। উৎসব চলে ৭ দিন ধরে। এসময় যারা ভিন জায়গায় যাবেন তারা ফিরে আসেন গ্রামে। এমনকি বক্সার অন্য গ্রাম থেকে এদের আত্মীয়রা এই উৎসবে সামিল হতে চলে আসেন এখানে। লোসার উৎসব শুরু হয় সকালে প্রার্থনার পর। এরপর সারাদিন চলে তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা। দুপুরে গ্রামে মনাস্ট্রির পাশে ছোর্টেনে গ্রামের সব পুরুষরা একসঙ্গে বসে আহার পর্ব সারেন। গ্রামের সব বাড়িতে আলাদা রান্না হলেও যে যার খাবার নিয়ে এসে অন্যের খাবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়া দাওয়া করেন। ভোজন পর্ব শেষ হলে বিকেল পর্যন্ত চলে তিরন্দাজি। এরপর চা বিরতির পর প্রার্থনায় সামিল হন গ্রামের সবাই। সন্ধ্যায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্টান। এখানে গ্রামের মেয়েরা ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে সমবেতভাবে নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে গ্রামের সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে হয়। সময়মতো উপস্থিত না হলে জরিমানা

ধার্য্য হয়। জরিমানার টাকা জমা হয় প্রধান লামার কাছে। সেই টাকা খরচ করা হয় জনহিতকর সাজে। আগে এই উৎসব দু-তিন দিন ধরে চলত বর্তমানে হোমস্টেতে পর্যটক টানার জন্য এরা লোসার উৎসব সাতদিন যাবৎ পালন করছেন, ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে।

লেপচাখা গ্রামের জনসংখ্যা মাত্র ২০০-র আশপাশে। বর্তমানে কয়েক মাস পরপর মেডিকেল ক্যাম্প করে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করা হয় সম্পূর্ণ সরকারি খরচে। তবে এ গ্রামের কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে চরম বিপাকে পড়তে হয়। কারণ, এ গ্রামে আজও কোনো গাড়ি যেতে পারে না, রাস্তা তৈরি না হওয়ার জন্য। এরকম একটি ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। ২০১৩ সালে আমি যখন দ্বিতীয়বার লেপচাখায় আসি পথে যেতে যেতে দেখেছিলাম গ্রামের একটি যুবক গ্রামে পৌঁছতে না পেরে গাছতলায় বসে কাতরাচ্ছিল তখন তার স্ত্রী গ্রামে পৌঁছে কয়েকজন লোককে নিয়ে আসে তারা একটি বাঁশের সঙ্গে ছেলেটিকে কাপড় দিয়ে বেঁধে কাঁধে করে ভয়ঙ্কর সুন্দর পাহাড়ি পথটাকে অতিক্রম করে সান্তারাবাড়ি অবধি নিয়ে আসে তারপর গাড়ি করে নিয়ে যায় আলিপুরদুয়ারে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। এরকমই এখানকার পরিস্থিতি। তবে, বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন পালকি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছে গ্রামবাসীদের কল্যাণার্থে।

লেপচাখা দেখার পর পরদিন আমরা ৩ কিমি দূরে রোভার্স পয়েন্টে যাই এবং ওখান থেকে গভীর জঙ্গল পথে রূপম ভ্যালি ৮ কিমি অর্থাৎ ভারত-ভুটান বর্ডার দেখে, রূপম ভ্যালিতে দ্বিপ্রাহরিক আহার পর্ব সেরে ফেরার পথে রোভার্স পয়েন্টে অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখে ফিরে আসি সদর বাজারে।

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in